হৃদয়জুড়ে ফিলিস্তিন

হৃদয়জুড়ে ফিলিস্তিন

আবদুল্লাহ আশরাফ

নাশাত

হৃদয়জুড়ে ফিলিস্তিন
আবদুল্লাহ আশরাফ

প্রথমপ্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রথমসংস্করণ : জানুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত
স্বত্ব : লেখক
মূল্য : ১৫০ (একশ পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-8125-2
মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

নাজরানা

হাফসা মনি

প্রিয়তমা

এবং প্রাণপ্রিয় মুআযকে

তুমি যখন বড় হবে, তখন এ বই পড়বে

জানবে সংগ্রামী মুজাহিদদের জীবনকথা,

যারা দেশের জন্য লড়াই করেছিল।

শুরুর কথা

আমার একটা কথা খুব মনে পড়ে। বাবা বলতেন আমার এ ছেলেকে দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমি তখন ছোট। মনে করতাম সত্যিই আমি দীনের জন্য ওয়াফকৃত। দীনের কাজই আমাকে করতে হবে। সে থেকে বুকের ভেতর জিহাদের তামান্না সব সময় কাজ করত।

বাবার হাতে আমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। তার হাত ধরে বাংলা শিখি। আদর্শলিপি এখনো চোখের তারায় ভাসে। বাংলা শেখার পর সর্বপ্রথম ছোটদের নবী নামের একটি বই হাতে তুলে দেন। প্রতিদিন পড়তাম। এমন বই আমি আর দেখি না। কিছুটা বড় হলে আমাকে শাহাদাতের তামান্না ও ফজিলত সম্পর্কিত একটি বই উপহার দেন। সুন্দর করে লিখে দেন 'স্নেহের আবদুল্লাহকে'।

শাহাদাতের তামান্না বুকে নিয়ে এতটুকু বড় হয়েছি। এ তামান্না জিয়ে থাকুক শাহাদাত পর্যন্ত। এই কামনাই করি। তাই যখন কোনো জনপদের নির্যাতন দেখি। শুনি বুকফাটা আর্তনাদ, তখন এক দু'কলম লিখতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় তাদের পাশে দাঁড়াতে। অন্তত তাদের দুঃখগুলো বোঝা ও অনুভব করার চেষ্টা করি। লাল কষ্টের গল্প লিখি। গল্প পড়ি।

আবদুল্লাহ আশরাফ
মারিয়া, কিশোরগঞ্জ
২/৪/২০১৯

সূচিপত্র

আলআকসা - ১১
প্রথম বীরের প্রথম জয় - ১৮
মহাবীর - ২৫
সালাহুদ্দীন আইয়ুবি - ৩২
সাহসী কিশোর - ৩৮
হুইলচেয়ার - ৪৫
ফিলিস্তিনের বীরাঙ্গনা - ৫০
চপেটাঘাত - ৫৫
চেতনার জয় - ৬২
গৌরবের গল্প - ৬৬
আলোকিত নক্ষত্র - ৬৯
নাকবা - ৭৩
ষড়যন্ত্র - ৭৯
কলমের ফেরিওয়ালা - ৮৫
উন্মুক্ত কারাগার - ৯০

আলআকসা

একটু পরপর পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে না দিতেই আবার শোনা যায় প্রকৃতির ডাক। মানুষ প্রাকৃতিক কার্য সমাধার জন্য ছড়িয়ে পড়ছে এখানে-সেখানে। কিন্তু রক্ষে নেই। তলপেট জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে যেন। অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে দেহ-মন। এভাবেই চোখের সামনে মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ল একটি শক্তিশালী জনপদ।

এই মহামারিতে প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার মানুষ মারা গেল। সকালে যে মানুষটা দিব্যি সুস্থতার সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিল, বিকালেই সে অসুস্থ। কী ভয়াবহ অবস্থা! চারদিকে মৃত্যুর আনাগোনা। মানুষের জীবন ভেঙে পড়ছে হতাশার নিদারুণ আঘাতে। গজব গজব বলে লোকজন দিনভর ছোটাছুটি করে; কিন্তু লাভ কী? মুক্তি যে মিলছে না কারো!

হঠাৎই যেন তারা মুক্তির পথ খুঁজে পেল। তাদের বোধোদয় হয়- এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় পূর্ণরূপে স্রষ্টাতে সমর্পণ। মুক্তির অন্বেষায় আল্লাহ-ভোলা মানুষগুলো তাই ক্রমেই বিশ্বাসী হয়ে উঠল। জীবনের ভুলগুলো স্মরণ করে স্রষ্টাকে আবার ডাকতে লাগল। 'হে রহমান, হে রাহিম, রহম করো। করুণা করো। আমরা যে তোমারই বান্দা। হে গাফফার, ক্ষমা করো। মার্জনা করো। তুমি যে ক্ষমাশীল।'

থামে না সে গজব। তবু ফিরে যায় না মৃত্যুর ফেরেশতা। ক্রমাগত করাঘাত করে যায় জনপদের দুয়ারে দুয়ারে।

তা হলে কি স্রষ্টা আমাদের দিকে তাকাবেন না? দয়ার চাদরে ঢেকে দেবেন না আমাদের কলুষিত আত্মা? এভাবেই কি আমরা তলিয়ে যেতে থাকব ধ্বংসের অতল গহ্বরে?

হতাশা ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে। জীবন আঁধারে ঢেকে যেতে থাকে যেভাবে স্বচ্ছ নীল আকাশ অন্ধকার করে দেয় কালো মেঘের দঙ্গল।

হঠাৎ তাদের বিবেক জেগে ওঠে। তারা ছুটে যায় স্রষ্টার প্রেরিত নবী হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম কি জানতেন না সে খবর? তার কাছে কি পৌঁছায়নি সেই ভয়াবহ আজাবের সংবাদ? অবশ্যই জানতেন। তিনি যে নবী! তিনি যে রাসুল! তার সাথে তো সরাসরি সংযোগ স্রষ্টার! কিন্তু তিনি অপেক্ষা করছিলেন, মানুষ যেন নিজের ভুল বুঝতে পারে। ফিরে আসে মালিকের কাছে। রাব্বে কারিমের পথে। এক সময় তিনি দেখলেন পাপীতাপী বান্দারা ফিরে আসছে স্রষ্টার দিকে। মন থেকে তারা অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে নিজেদের কলুষিত জীবনের জন্য। তখন তিনি তাদের হয়ে ফরিয়াদ করলেন রাব্বে কারিমের কাছে- 'হে কারিম, হে রাহিম, মাফ করো। দয়া করো। তারা তোমারই বান্দা। তোমার পথের পথিক। আজাব উঠিয়ে নাও।'

নবী-রাসুলের ফরিয়াদ ফিরিয়ে দেন না রব। তিনি তাই ফেরালেন না প্রিয় রাসুল দাউদ আলাইহিস সালামের ফরিয়াদ। ক্ষমা করে দিলেন সেই জনপদবাসীকে। মুহূর্তেই আজাব উঠিয়ে নিলেন। সৃষ্টি করে দিলেন মনোরম পরিবেশ। আনন্দে হেসে উঠল সারা জনপদ। পৃথিবী নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাদের সম্মুখে।

সবকিছু শান্ত হয়ে এলে ডাকলেন দাউদ আলাইহিস সালাম সবাইকে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তাদেরকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে পাওয়া প্রত্যাদেশ। বললেন- রাব্বে কারিম যে তোমাদের আজাব থেকে মুক্তি দিলেন, সেজন্য শুকরিয়া আদায় করো তাঁর।

উৎফুল্লচিত্তে মেনে নিল জনপদবাসী নবীর প্রস্তাব। রাজি হলো সবাই স্রষ্টার শুকরিয়া আদায়ের জন্য। নবীর কাছেই তারা প্রস্তাব করল, যেন তিনিই তাদের জানিয়ে দেন- কোন উপায়ে আদায় করা হবে স্রষ্টার এমন দয়ার উত্তম শুকরিয়া!

দাউদ আলাইহিস সালাম তাদের জানিয়ে দিলেন- আল্লাহর জন্য একটি ইবাদতগাহ নির্মাণ করো। এটা হবে তোমাদের থেকে তার প্রতি সর্বোত্তম শুকরিয়ার প্রকাশ।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের কথা শুনে চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সিজদার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হবে? সত্যিই বনি ইসরাইল মসজিদ নির্মাণ করবে? উফ দারুণ! কী আনন্দ! কী খুশি! চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। সবাই প্রস্তুতি নিলো মসজিদ নির্মাণ করতে। কিন্তু স্থান যে নির্ধারণ করা হয়নি! কোথায় হবে সে মসজিদ? কোন জায়গায় নির্মিত হবে স্রষ্টার ইবাদতগাহ?

সবাই আবার হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের শরণাপন্ন হলো। দাউদ আলাইহিস সালাম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। ইশারা হলো। ইলহাম এলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে। সে ইলহাম অনুযায়ী তিনি জায়গা নির্ধারণ করে দিলেন। পছন্দ হবার মতোই জায়গা। বনি ইসরাইলের সবাই একবাক্যে মেনে নিলো। যার যার জমি ছিল সেখানে, সবাই ওয়াকফ করে দিতে লাগল একে একে। সবার মুখে আনন্দ-দ্যুতি খেলা করতে লাগল। সব জমিই ওয়াকফ হয়ে গেল আল্লাহর ইবাদতগাহ নির্মাণের জন্য। তবে তখনও বাকি একখণ্ড জমি।

সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কখন আসবে সে? সে কি তার অংশ ওয়াকফ করবে? সম্মত হবে কি সবার সাথে মসজিদ নির্মাণের কাজে? কারো কিছু জানা নেই। ভয়-শঙ্কা নিয়ে অপেক্ষমাণ সবাই- শেষমেশ মসজিদ নির্মাণ হবে তো!!

সবার যেন আর তর সইছিল না। এদিক-সেদিক লোক পাঠিয়ে তাকে হাজির করা হলো। জানানো হলো তাকে সব, সবিস্তারে। কিন্তু না, সে রাজি হলো না। মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির তার অংশ সে ওয়াকফ করবে না। নিমেষেই অন্যান্যের মুখ কালো হয়ে এলো। হতাশার অন্ধকার ছেয়ে ফেলল তাদের মনের আকাশ। তবে কি থমকে যাবে তাদের স্বপ্ন! নির্মাণ হবে না আল্লাহর ইবাদতগাহ! তা কী করে হয়!

সবাই চেপে ধরল তাকে। অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু না, কারো আবদারেই কোনো কাজ হলো না। শেষমেশ আল্লাহর নবী তাকে বুঝালেন। শোনালেন মসজিদের জন্য ভূমিদানের ফজিলত। শেষমেশ সে রাজি হলো। নবীর মুখে ফজিলতের কথা শুনে? না। সে জমির বিনিময়ে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল, যা শুনে বিস্ময়ে সবাই থ।

সে ভূমির সামান্য অংশের বিনিময়ে তার জমির চারপাশে বুক-সমান উঁচু দেয়াল গাঁথা হবে। তারপর সেই চতুষ্কোণ জমির মধ্যিখানে ঢালা হবে স্বর্ণমুদ্রা। জায়গাটা যখন কানায় কানায় ভরে উঠবে স্বর্ণমুদ্রায় তখন সে তার জমির অংশ ছেড়ে দেবে আল্লাহর ইবাদতগাহ নির্মাণের জন্য।

তার এমন অদ্ভুত আবদারে ক্ষেপে গেল সেই জনপদের অধিবাসীরা। তারা সমস্বরে বলে উঠল- এমন বিনিময়ের কথা আমরা এই জীবনে শুনিনি! এমন দাবি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জমি ছিনিয়ে নেব তার থেকে।

দাউদ আলাইহিস সালাম সবাইকে নিবৃত্ত করলেন। না, তোমরা এমন করতে পারো না। ছিনিয়ে নেওয়া জায়গায় আল্লাহর ইবাদতগাহ নির্মিত হতে পারে না। তার প্রস্তাব মেনে নিয়েই সেখানে নির্মিত হবে মসজিদ।

নবীর আদেশ। ফেলে দেবার উপায় কী! সবাই মেনে নিল দাউদ আলাইহিস সালামের পরামর্শ। তোড়জোড় পড়ে গেল জমির মালিকের কাঙ্ক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা জোগাড়ের জন্য। সবাই দৃঢ় সংকল্পে স্থির হয়- মসজিদ আমরা নির্মাণ করবই।

সুখের কথা হলো- লোকটি সবাইকে পরীক্ষা করছিল। সে দেখতে চাচ্ছিল মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের মনোবল কতটা দৃঢ়! তারা সত্যিই মন থেকে চায় আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে, নাকি এটা তাদের সাময়িক আবেগ! কিন্তু সে যখন জনপদবাসীর সবার দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখতে পেল তখন সে তার উদ্দেশ্য আর গোপন রাখল না। বলে দিল তার পরীক্ষাগ্রহণের কথা। সে বলল, 'তোমাদের

সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আমি খুশি। আমার কিছুর প্রয়োজন নেই। আমি চেয়েছিলাম জমি ও স্বর্ণমুদ্রা উভয়টি মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করব। আমাকে কিছুই দিতে হবে না। তোমরা নির্বিঘ্নে মসজিদ নির্মাণ করো।'

অকস্মাৎ তার মুখে এমন কথা শুনে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল সবার মাঝে। সবাই খুশিতে কাজে নেমে পড়ল। যার যা আছে তা নিয়ে লেগে গেল মসজিদ নির্মাণে। প্রাচীর স্থাপনের জন্য খুড়তে শুরু করল। কে দেখে সেই আনন্দ! সে খুশি! আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারপাশ। ইটের পর ইট রেখে স্থাপন করা হচ্ছে দেয়াল। মানুষ-সমান দেয়াল তোলা হলো। জিকিরে জিকিরে এগুতে লাগল মসজিদের নির্মাণকাজ।

এমন সময় ওহি এলো আল্লাহর পক্ষ থেকে- দাউদ, আমি বনি ইসরাইলের শুকরিয়া গ্রহণ করলাম। আমি এ কাজ তোমার ছেলে সুলাইমান-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করব। এ কাজ আপাতত স্থগিত রাখ।'

কী আনন্দ-উদ্দীপনা আর উচ্ছ্বলতায় এগিয়ে চলছিল মসজিদের নির্মাণ-কাজ! আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসায় নির্মিত হচ্ছিল দেয়ালের পর দেয়াল। হঠাৎ এলো স্রষ্টার নতুন আদেশ! আর কি এগোনো যায়! যায় না। মসজিদ নির্মাণের আদেশদাতাই যখন নির্মাণকাজ বন্ধ করার হুকুম করেন, কার সাধ্য আর একটা ইট গেঁথে দেয় দেয়ালের গায়ে। থমকে গেল সব কাজ। মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া তো উদ্দেশ্য নয়। মূল লক্ষ্য মসজিদের মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন। আর তার সন্তুষ্টি হলো তার হুকুম মানার মধ্যে, কোনো কাজের বাহ্যিক পূর্ণতা কিংবা অপূর্ণতার ভেতর নয়।

হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। সমগ্র পৃথিবীর শাসনভার রাব্বুল আলামিন তার হাতে অর্পণ করেছিলেন। কেবল মানুষ নয়; জিন পর্যন্ত তার হুকুম তামিলে বাধ্য ছিল। শুধু কি মানুষ আর জিন! বনের পশু, পানির মাছ, গর্তের পিপীলিকা- এককথায় আল্লাহর সব সৃষ্টি ছিল তার শাসনাধীন। তিনিই একমাত্র বাদশাহ, যার শাসন ক্ষমতা এতটা বিস্তৃত ছিল।

তিনি তার পিতার অসিয়ত পূরণের উদ্যোগ নিলেন। পূর্বের চাইতে বিপুল উৎসাহে শুরু হলো মসজিদের নির্মাণকাজ। এবার মানুষের সাথে জিনেরাও শামিল হলো মসজিদের নির্মাণকাজে।

মসজিদের নির্মাণকাজ চলছে। একটি কাঠের গম্বুজের ভেতর দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছেন হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। বড় বড় পাথর কেটে নির্মাণ করা হচ্ছে মসজিদ। পৃথিবীর আনাচকানাচ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন পাথর। জিনে-ইনসানে কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করে চলেছে। কারও মধ্যে কোনো বিরাম নেই। কোনো আলস্য নেই। ক্লান্তি নেই। আনন্দচিত্তে কর্মমুখর হয়ে আছে সবাই।

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে আল্লাহর নবীর। তার বড় সাধ নির্মিত মসজিদের রূপ দেখে যাবেন। দিনরাত এককরে তাই কাজ করে চলেছে সবাই। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে ছিল ভিন্ন! তার ইচ্ছার কোনো ব্যত্যয় হয় না!

নির্ধারিত সময়ে বেজে উঠল সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুঘণ্টা। একটি কাঠের লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। সেই অবস্থায় তার পবিত্র রুহ নিতে হাজির হয়ে যায় মৃত্যুর ফেরেশতা। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান সুলাইমান আলাইহিস সালাম। কিন্তু এখানে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়। মসজিদের নির্মাণকাজ যাতে চলতে থাকে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখলেন। প্রাণ চলে গেলেও তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন লাঠিতে ভর করে।

দৃষ্টি পড়ে না। এক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বস্থানে। জিন-ইনসান কাজ করে যেতে থাকে দিনরাত। কেউ বুঝতেও পারেনি সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে নেই এই দুনিয়ায়! জিন-ইনসান তো যা চোখে দেখে, তাই বিশ্বাস করে। তারা তো মনের খবর জানে না। জানে না অজানা কথা। অদৃশ্যের কথা। প্রায় এক বছরে সেই কাজ শেষ হয়। মসজিদ অপূর্বরূপে দৃশ্যমান হয়।

এ দিক দিয়ে তার লাঠিটি উইপোকা খেতে থাকে। মসজিদের নির্মাণকাজ এগিয়ে চলে; সমান্তরালে উইপোকা ফোঁকলা করে দিতে থাকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের লাঠি। এক সময় ভেঙে পড়ে লাঠি। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিষ্প্রাণ দেহ।

প্রথম বীরের প্রথম জয়

আকাশসমান তরঙ্গমালা উপেক্ষা করে অলৌকিকভাবে লোহিতসাগর পার হলেন মুসা আলাইহিস সালাম। সঙ্গে ছিল বনি ইসরাইল। সামনে বিশাল মরুভূমি। বালু আর বালু। একটু ছায়া নেই। নেই বৃক্ষ, পত্রপল্লব। সবুজের চিহ্নটুকু নেই। নিরাশা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল সবার মনে।

বিশাল বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে, নতুন বিপদের মুখে। অতীতের দুঃখগুলোও তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। অকথ্য নির্যাতনের পরেও তো সেখানে খাবার ছিল। পানি ছিল। ছিল গাছের ছায়া; কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই।

মুসা আলাইহিস সালাম তাদের সঙ্গে আছেন। তাদের আবার ভয় কীসের! আল্লাহর নবী আছেন তাদের সাথে। আর কীসের অভাব তাদের!

মুসা আলাইহিস সালাম যখন জানতে পারলেন তাদের হতাশার কথা, তখন মাওলার কাছে দোয়া করলেন। তার ভাণ্ডারে তো কোনো কিছুর অভাব নেই। শুধু চাইতে হয়। কিন্তু মানুষ চাইতে জানে না। সে মাওলার সামনে হাত তুলতে রাজি হয় না; অথচ সে জানে না-চাইলে কিছুই কারো থেকে পাবার আশা করা যায় না। মুসাফিরের দোয়া মাওলা আরো বেশি কবুল করেন। মুসা আলাইহিস সালাম মিনতি করে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরদিগন্ত থেকে মেঘমালা উড়ে আসতে লাগল। দলে দলে। যেন নীল আকাশে সাদা সামিয়ানার ছড়াছড়ি। দেখতে দেখতে ঝলসানো রোদ আড়াল করে তাদের ছায়া দিতে লাগল সেই মেঘমালা। অবাক সবাই। সবার চোখ জুড়িয়ে গেল। অন্তর ঠান্ডা হয়ে এলো। শান্ত হলো সবাই। নিমেষেই দূর হয়ে গেল সমস্ত অবসাদ; কিন্তু খাবার? পানি?

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বান্দার কতটুকু আর ধারণা! তিনি যে ধারণার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে কুয়াশা পাঠালেন। সোনারুপার পাত্রে পাঠালেন পবিত্র খাবার; মান্না ও সালওয়া। কী সুস্বাদু সে খাবার! কী মজার সে রান্না! কচি পাখির ভুনা গোশতের মতো স্বাদ। এবং একদমই বিনাশ্রমে। এ যে সাক্ষাৎ-মুজেজা। এমন মুজেজার কথা তারা না শুনেছে কোনো দিন আর না দেখেছে।

খাবারের ব্যবস্থা তো হলো। কিন্তু খাবার খেলেই যে তৃষ্ণা পায়! শুষ্ক মরুর মতো খা-খা করে ওঠে বুকের ভেতরটা। পানি? স্বচ্ছ শীতল মিঠা পানির কী হবে? আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মুসা আলাইহিস সালাম প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করেন। প্রবাহিত হয় জলধারা। টলটলে স্বচ্ছ সে পানি। আনন্দে উৎফুল্ল সবাই। যেন আবে-হায়াত পেয়েছে সবাই। আবে-হায়াতের চেয়ে কম কী? বিজন মরুভূমিতে এক কাতরা পানি আবে-হায়াতের চেয়ে কম না।

প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য আলাদা জলধারা। কী সুন্দর ও উত্তম বণ্টন! একটু কষ্ট হয়নি নিজেদের জলস্থল চিনে নিতে। এভাবে নানা কল্যাণ আর খোদায়ি সাহায্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছিল তাদের দিনরাত।

কিন্তু মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। সে ভুলে যায় প্রভুর নেয়ামতের কথা। ভুলে যায় তার দান ও অনুগ্রহের কথা। এই পরম্পরার ব্যত্যয় হলো না বনি ইসরাইলের বেলায়ও। তারা ভুলে বসল প্রভুর নেয়ামতের কথা। অস্বীকার করে বসল নেয়ামতদাতাকে। আর মজে গেল মহান প্রভুর অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের ভেতর। আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে গোবৎসের পূজা শুরু করে দিল। একটিবার ভয়ে কাঁপল না। ভাবল না পর্যন্ত। তাদের এমন কর্মকাণ্ডে খুব নারাজ হলেন তিনি। কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন বনি ইসরাইলের ব্যাপারে।

একদিন আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে জানালেন এক নতুন ভূমির কথা। যেখানে আলোছায়া খেলা করে। সবুজের ছড়াছড়ি। মুসা আলাইহিস সালাম খুশি হলেন। বনি ইসরাইলকে

ডেকে পাঠালেন। সবাই খুশিমনে ছুটে এলো মুসা আলাইহিস সালামের তাঁবুর কাছে। দেখতে দেখতে জনসমুদ্র। তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য একটি সুজলা-সুফলা নয়নাভিরাম পবিত্র ভূমি নির্ধারণ করেছেন। যার নাম ফিলিস্তিন। তোমরা সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করবে।'

সে সময় ফিলিস্তিন ছিল আমালিকা সম্প্রদায়ের দখলে। ওরা ছিল বিশাল দেহের অধিকারী। যেকেউ ভয় না পেয়ে পারবে না। এমন সম্প্রদায়ের কথা শুনে বনি ইসরাইল হতাশ হলো। তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ইতঃপূর্বে মানুষের মুখে সেই সম্প্রদায়ের কথা তারা শুনেছে। শুনেছে তাদের নানা গল্পকাহিনি।

বনি ইসরাইল মেনে নিতে পারল না তাদের নবীর কথা। তারা মুসা আলাইহিস সালামের কথা অমান্য করে বসল। বলে দিল- মুসা, ওই দেশে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতির বসবাস। তারা থাকতে সেখানে আমাদের পক্ষে প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আগে তাদের বিতাড়িত করতে হবে। আর বিতাড়নের জন্য দরকার হবে লড়াই করার। কিন্তু ওদের সাথে লড়াই করে পেরে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব না।'

মুসা আলাইহিস সালাম তাদের কথা শুনে বিশ্বস্ত সাথি ইউশা ইবনে নুনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ফিলিস্তিনে পাঠালেন। তারা সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এসে জানাল, 'ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা দেখতে বিশাল দেহী; কিন্তু তেমন সাহসী ও লড়াকু নয়। বনি ইসরাইল একযোগে আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।'

কিন্তু কাপুরুষ বনি ইসরাইল কোনোভাবেই রাজি হলো না পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে যেতে। তারা এখানেই থাকবে, না খেয়ে মরবে, তবু যুদ্ধ করবে না।

একদিন এক বিশাল সমাবেশে মুসা আলাইহিস সালাম জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে বললেন তাদের ভবিষ্যৎ ও শান্তির কথা। জানিয়ে দিলেন ফিলিস্তিনই তাদের একমাত্র মুক্তির পথ। বলে